গোপালচন্দ্র
ভট্টাচার্য
বাংলার
মাকড়সা

# বাংলার মাকড়সা

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

দে'জ পাবলিশিং ।। কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম দে'জ সংস্করণ
বইমেলা, ১৯৯১
মাঘ, ১৩৯৭

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ, ১৩৫৫



প্রচ্ছদঃ গৌতম রায়

প্রকাশক
শ্রী সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩, বাঙ্কম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা৭০০৭৩

ফটোটাইপ সেটিং
ক্যালকাটা লেজার গ্রাফিকস্
১ নং সুরেন ঠাকুর রোড,
কলকাতা – ৭০০০১৯

শ্রী স্বপনকুমার দে
দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০৭৩

**দাম ঃ ১৫ টাকা**
Rupees fifteen only

আমার পৌত্র

টুটু

১৫ জুলাই ১৯৬৯  ১৮ মার্চ ১৯৭৫

এই লেখকের আমাদের অন্যান্য বই

বাংলার কীট-পতঙ্গ

বিজ্ঞান অমনিবাস

করে দেখ তিন খণ্ড এবং অখণ্ড সংস্করণ

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী সংবাদ

জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা খবর

মানবকল্যাণে পারমাণবিক শক্তি

# প্রকাশকের ভূমিকা

'বাংলাদেশে বিজ্ঞানের যে-সব বই প্রকাশিত হয়, বিশেষ করে ছেলেদের জন্য, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুবাদ এবং অনেক সময়েই ভুল অনুবাদ । বাংলাদেশে কৃতী বৈজ্ঞানিকের অভাব নেই; কিন্তু তাঁরা প্রায়ই বিজ্ঞান সম্বন্ধে বাংলাভাষায় ছোটদের বোধগম্যভাবে লিখতে—হয় অপারগ নয় অনিচ্ছুক । "বাংলার মাকড়সা"র লেখক কিন্তু এই সাধারণ নিয়মের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম । শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কেবলমাত্র যে কৃতী বৈজ্ঞানিক তা নন, বাংলাদেশের বিজ্ঞান সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি একজন সুপরিচিত লেখক । গোপালবাবু আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের প্রিয় ছাত্র এবং ছাব্বিশ বছরের বেশী বসু বিজ্ঞান মন্দিরে প্রাণিবিজ্ঞান ও কীটপতঙ্গ সম্পর্কিত গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। দেশে এবং বিদেশে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় তাঁর মৌলিক গবেষণার বিষয় প্রকাশিত হয়েছে । তিনি এদেশের একজন প্রখ্যাত 'ন্যাচরালিসট'ও বটেন । বাংলাদেশের বহু মাসিক ও দৈনিক পত্রিকায় তাঁর অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে । গবেষণা সম্পর্কে কীট-পতঙ্গ প্রতিপালন ও পর্য্যবেক্ষণ করবার সময়ে তাদের আচার-ব্যবহার বিষয়ে যে-সব কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তারই কিছু কিছু ছোটদের জন্য "বাংলার মাকড়সা"য় লিপিবদ্ধ করেছেন । সবগুলো ব্যাপারই তাঁর নিজের দেখা এবং সমস্ত ফোটোগ্রাফগুলোও তাঁর নিজের তোলা ।

আমরা আশা করি ভবিষ্যতে গোপালবাবুর লেখা এই ধরনের বই আরও প্রকাশ করতে পারব ।' [কলিকাতা, শ্রাবণ, ১৩৫৫ ।]

'বাংলার মাকড়সা'-র প্রথম সংস্করণের প্রকাশকের নিবেদন, হুবহু পুনর্মুদ্রিত করলাম । এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশের পর চল্লিশ বছর পার হয়ে গেছে। গোপালচন্দ্র ন'বছর আগে প্রয়াত হয়েছেন । প্রকাশকের প্রত্যাশা চরিতার্থ করে প্রথম তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি আজও সমানভাবে দুই বাংলায় সমাদৃত ।

আমরা কিশোরদের জন্য লেখা এই মহামূল্যবান গ্রন্থটি প্রয়াত লেখকের পঁচানব্বইতম জন্মদিনে বাংলাভাষীদের হাতে তুলে দিলাম । এই সংস্করণ সম্পাদনা করা হয়েছে আমাদের প্রকাশনালয় থেকে । আশা করছি মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চায় আগ্রহীদের কাছে বইটি সমাদৃত হবে ।

কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৯০

সুধাংশুশেখর দে

# সূচী

# বাংলার মাকড়সা

আমাদের বাংলাদেশে এক ইঞ্চির প্রায় পঁচিশ ভাগের এক ভাগ থেকে চার-পাঁচ ইঞ্চি পর্যন্ত বিভিন্ন আকারের অসংখ্য রকমারি মাকড়সা দেখতে পাওয়া যায় । তোমরা অনেকেই হয়তো জাল-বোনা মাকড়সার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত । কিন্তু সব রকমের মাকড়সাই জাল বোনে না । যারা জাল বোনে একমাত্র তাদের রকমারি দেখলেই অবাক হয়ে যাবে । কেউ জাল বোনে খাড়াভাবে, কেউ বোনে শয়ানভাবে । কারো জাল তেকোনা, কারো জাল বহুকোণী । কারো জাল তাঁবুর মতো, আবার কারো জাল পাতলা কাগজের মতো সমতল । বিভিন্ন জাতের মাকড়সার জাল বোনার কৌশল এবং কারুকার্যও বিচিত্র রকমের । কয়েক জাতের মাকড়সা নির্দিষ্ট আকারের জাল না বুনে এলোমেলোভাবে সুতো ছড়িয়ে রাখে । জাতীয় পার্থক্য হিসাবে এলোমেলো সুতো ছড়ানোর মধ্যেও আবার বিচিত্র রকমারি দেখা যায় । এছাড়া বিভিন্ন জাতের অসংখ্য রকমারি মাকড়সা আছে যারা মোটেই জাল বোনে না, কেবল ইতস্তত ঘোরাফেরা করে । এদের মধ্যে কয়েক জাতের মাকড়সা বিড়ালের মতো ওত পেতে দূর থেকে শিকারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে । কতকগুলি মাকড়সা সামনের দিকে হাঁটতে পারে না, কাঁকড়ার মতো পাশের দিকে হাঁটে । কয়েক জাতের মাকড়সা-র আবার ফুল, ফল, লতা-পাতার রঙের সঙ্গে গায়ের রং মিলিয়ে শিকার ধরবার জন্যে সারাদিন এক জায়গায় চুপটি করে বসে থাকবার অভ্যাস । ঘাস-পাতার মধ্যে বিভিন্ন জাতের ছোটো ছোটো অনেক মাকড়সা আছে যাদের গায়ের রং বেলোয়ারি কাচের মতো ঝকমকে । কেউ সবুজ, কেউ নীল, কেউ বেগুনে, কেউ বা রামধনুর মতো বিচিত্র বর্ণের । সাধারণত মাকড়সারা স্থলচর প্রাণী; কিন্তু কয়েক জাতের জলচর এবং উভচর মাকড়সাও দেখা যায় । এছাড়া আর এক রকমের অদ্ভুত মাকড়সা দেখা যায়, যাদের চেহারা মোটেই মাকড়সার মতো নয় । চোখের সামনে দেখেও পিঁপড়ে ছাড়া তাদের আর কিছু বলে ভাবতেই পারবে না । কাঠ-পিঁপড়ে, খুদে, নালসো, ডেঁয়ো প্রভৃতি যে কোনো পিঁপড়েই হোক না কেন, গায়ের রং এবং চেহারায় হুবহু তাদের মতো দেখতে বহুজাতের অনুকরণকারী মাকড়সা রয়েছে । একমাত্র

কলকাতা শহরের আশেপাশেই অনেক রকমের বিভিন্ন জাতের পিঁপড়ে-মাকড়সার সন্ধান পেয়েছি। মাকড়সারা সামাজিক প্রাণীদের মতো একসঙ্গে বাস করে না। সর্বদাই তারা একাকী বিচরণ করে। কোনো কারণে দু'টিতে হঠাৎ সামনা-সামনি পড়ে গেলেই ঝগড়া বেধে যায়। ঝগড়ার ফলে একের মৃত্যু বা উভয়ের অঙ্গহানি সুনিশ্চিত। কিন্তু আমাদের দেশে কয়েক জাতের সামাজিক মাকড়সাও দেখা যায়। এরা অনেকে মিলে দলবদ্ধভাবে বাস করে এবং সকলে মিলেই শিকার ভাগাভাগি করে খায়।

মাকড়সারা সাধারণ কীট-পতঙ্গ থেকে আলাদা শ্রেণীর [ মাকড়সা আরাকনিদা গোষ্ঠির অমেরুদন্ডী প্রাণী ]। সাধারণ কীট-পতঙ্গদের শরীর—মাথা, বুক এবং পেট এই তিন ভাগে বিভক্ত। তাদের ছয়টি পা, দুটি চোখ এবং দুটি শুঁড় থাকে। কিন্তু মাকড়সার মাথা আর বুক একত্র সংলগ্ন। এদের আটটি পা এবং আটটি চোখ। অবশ্য দু-একটি জাতের মধ্যে ছয়টি বা চারটি চোখও দেখা যায়। শরীরের পিছনদিক থেকে সুতো বের করা মাকড়সাদের একটি বিশেষত্ব। এরা বাচ্চা অবস্থা থেকে প্রায় পাঁচ ছয় বার খোলস বদল করে ক্রমশ বড় হয়ে ওঠে। মাকড়সারা পুরাদস্তুর মাংসাশী।

তোমরা হয়তো ভাবতে পার—মাকড়সার মতো একটা নগণ্য প্রাণী সম্বন্ধে কী আর এমন একটা জানবার কথা থাকতে পারে। কিন্তু এদের বিচিত্র আকৃতি, চাল-চলন এবং জীবনযাত্রাপ্রণালীর ব্যাপারগুলো লক্ষ্য করে দেখলে এবিষয়ে কৌতূহলী না হ'য়ে থাকতে পারবে না। এস্থলে সব রকমের মাকড়সার বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তোমাদের কৌতূহল পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে আমাদের দেশের মাত্র গুটিকয়েক মাকড়সার জীবনযাত্রার কথা বলছি। এদের জীবন থেকে জানবার মতো কিছু আছে কিনা—সেকথা তোমরাই বিচার করবে।

# মেছো-মাকড়সা

অনেক দিন আগের কথা [ ৫৮বছর আগে ]। দমদম বিমান-ঘাঁটির কাছাকাছি একটা এঁদো পুকুরের ধারে বসে আছি। শালুক, হিঞ্চে, কলমি-লতায় পুকুরটা প্রায় ছেয়ে গেছে। তবে মাঝে মাঝে খানিকটা জায়গা বেশ পরিষ্কার; জল দেখা যায়। জল-ঘাসের উপর কয়ার-ফড়িঙের ক্রিং-ক্রিং শব্দ আর বাগানের আশপাশ থেকে উইচ্চিংড়ির একটানা বাজনা চলছিল। বেশ কাছে, পরিষ্কার জলের উপর একটা শালুক পাতার দিকে নজর পড়তেই দেখি—পাতাটার একধারে একটা মাকড়সা বসে

পিছনের দু'পা দিয়ে পাতাটাকে আঁকড়ে ধরে মাকড়সাটা জলের উপর বসে আছে
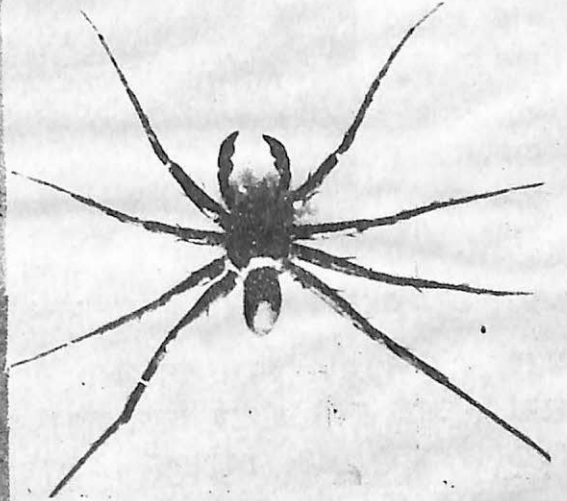
মেছো-মাকড়সা (পুরুষ)

মাছটাকে পাতার উপর তুলে মাকড়সাটা তার ঘাড় কামড়ে পড়ে রইল

আছে। কেন ওটা অমন চুপ করে বসে আছে—জানবার জন্যে খুবই কৌতূহল হলো। আর একটু এগিয়ে গিয়ে লক্ষ্য করে দেখলাম—পাতাটার কাছেই কয়েকটা তেচোকা মাছ ভেসে বেড়াচ্ছে। একবার সন্দেহ হলো—তবে কি মাকড়সাটা মাছগুলোর গতিবিধি লক্ষ্য করছে? না, তা হতেই পারে না; জলের মাছের সম্বন্ধে মাকড়সার কৌতূহলের কী কারণ থাকতে পারে! আধঘন্টারও বেশি সময় কেটে গেল, মাকড়সাটা ঠিক একভাবেই বসে আছে। এর মধ্যেই, ঘোরাফেরা করবার মুখে, কয়েকটা মাছ পাতাটার খুব কাছে এসে পড়তেই মাকড়সাটা যেন ছিটকে এসে জলের উপর পড়ল। ভয় পেয়ে মাছগুলো পাতাটার নীচে অদৃশ্য হয়ে

গেল । মাকড়সাটা কিন্তু পিছনের দু'পা দিয়ে পাতাটাকে আঁকড়ে ধরে জলের উপরই বসে রইল । প্রায় দশ-বারো মিনিট সব চুপচাপ—মাকড়সাটা একই অবস্থায় জলের উপর ভাসছে । এর মধ্যে পাতার তলা থেকে মাছগুলোও বাইরে এসে আগের মতোই ঘোরাফেরা করছিল । জলের মধ্যে হঠাৎ আবার একটু আলোড়ন দেখা গেল । মাকড়সাটা একটা মাছকে ঘাড়ে কামড়ে ধরে একেবারে পাতার উপর টেনে তুলেছে । চক্ষের নিমেষে কেমন করে কী যে ঘটে গেল ভালো করে লক্ষ্য করতেই পারি নি । মাছটাকে পাতার উপর তুলে এনেও মাকড়সাটা খানিকক্ষণ তার ঘাড় কামড়েই পড়ে রইল । কিছুক্ষণ ছটফট করতে করতে অবশেষে মাছটা নিষ্পন্দ হয়ে গেল । মাকড়সাটা তখন তাকে ছেড়ে দিয়ে পাতাটার এদিক-ওদিক কিছুক্ষণ ঘুরেফিরে দেখল । তারপর আবার মাছটার কাছে এসে চারিদিকে ঘুরে মিনিট দুয়েক চুপ করে বসে রইল । তারপর লেজের দিক থেকে চিবুতে শুরু করে দিল । ব্যাপার দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম । তবে তো দেখছি মাকড়সারা মাছ ধরেও খায় ! কিন্তু একটা ঘটনা থেকেই তো আর কোনো কিছু জাতীয় স্বভাব বলে সিদ্ধান্ত করা যায় না ! কাজেই এ জাতের কতকগুলো মাকড়সা ধরে নিয়ে পরীক্ষাগারে পুষে তাদের হালচাল লক্ষ্য করবার মনস্থ করলাম । ফোটো তোলবার এবং পোকা-মাকড় ধরবার যাবতীয় সরঞ্জাম সঙ্গেই ছিল । অতি সন্তর্পণে জলে নেমে গেলাম । প্রায় হাঁটু জল । পাতাটার কাছে গিয়ে সূক্ষ্ম নেটের জাল চাপা দিলাম; কিন্তু খুঁজে দেখি—মাকড়সাটা নেই, পাতার উপর অর্ধভুক্ত মাছটা পড়ে আছে । পাতাটা ছিল পরিষ্কার জলের উপর, আশে-পাশে দু'একটি জল-ঘাসের সরু ডগাটুকু জেগে আছে মাত্র । মাকড়সাটা তবে গেল কোথায় ? চোখের সামনে এমনভাবে অদৃশ্য হওয়ার রহস্যটা কিছুই অনুমান করা সম্ভব হলো না । কী করা যায়—জলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই অবাক হয়ে ভাবছি । হঠাৎ দেখি সামনেই জলের নীচে থেকে মাকড়সাটা উপরে ভেসে উঠল । রহস্যটা এবার পরিষ্কার হয়ে গেল । এরা দেখছি, ডুব দিয়ে জলের নীচেও লুকিয়ে থাকতে পারে !

একটু নতুন রকমের কায়দা করে তিন-চার দিনের চেষ্টায় কতকগুলো ডুবুরি মাকড়সা ধরে এনে পরীক্ষাগারের প্রকান্ড কাচের চৌবাচ্চায় ছেড়ে দিলাম। চৌবাচ্চার মধ্যে জল-ঘাস ও শালুক-পাতা যথেষ্ট ছিল । মাকড়সাগুলো সেখানে ঠিক স্বাভাবিক অবস্থাতেই চলাফেরা করতো । বহুদিন ধরে মাকড়সাগুলোকে পুষে তাদের জীবনযাত্রার অনেক ব্যাপারই পরিষ্কার ভাবে লক্ষ্য করতে পেরেছি । চৌবাচ্চার মধ্যে অনেক তেচোকা মাছও ছেড়ে দিয়েছিলাম । অনেক সময়েই এই চৌবাচ্চার জলের উপর মাকড়সাকে মাছ শিকার করতে দেখেছি । মাকড়সার লক্ষ্য অব্যর্থ । দু'একটি ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাছগুলো শিকারীর কবলে পড়ে প্রাণ

কাচের পাত্রে জলের নীচে জল-ঘাসের ডাঁটা আঁকড়ে ধরে মেছো-মাকড়সা লুকিয়ে আছে

হারাতে বাধ্য হয়েছে।

এই মাকড়সাগুলোর স্বভাব এমনই অদ্ভুত যে কোনো কারণে ভয় পেলেই ডুব দিয়ে জলের নীচে চলে যায় এবং লতা-পাতা আঁকড়ে বসে থাকে। পনেরো-বিশ মিনিটেরও বেশি সময় একটানা জলের নীচে ডুবে থাকতে এদের কোনোই কষ্ট হয় না। এই মাকড়সাদের শরীরে জল লাগে না মোটেই। জলের নীচে এদের দেখায় যেন সর্বশরীরে একটা রূপার আবরণ জড়িয়ে বসে আছে।

স্ত্রী এবং পুরুষভেদে এই মাকড়সাগুলোর আকৃতি এবং গায়ের রং বিভিন্ন। স্ত্রী-মাকড়সারা পুরুষের চেয়ে আকারে বড় এবং অনেকটা স্থূলকায়। পুরুষদের গায়ের রং কালো ভেলভেটের মতো। স্ত্রী-মাকড়সার রং ধূসর এবং পায়ের উপর ডোরা কাটা। পুরুষ মাকড়সার মুখের কাছে, বোঁটার মাথায় মোচার মতো কালো রঙের দুটি যন্ত্র আছে। কালো বোঁটা গায়ে সাদা রঙের একটি মোটা ডোরার জন্যে পুরুষ মাকড়সাগুলোকে ভারি সুন্দর দেখায়। বর্ষাকালে এদের ডিম পাড়বার সময়। ডিম পাড়বার সময় হলেই এদের স্ত্রী-পুরুষ মিলনের একটা অপূর্ব

দৃশ্য দেখা যায় । স্ত্রী-মাকড়সাকে দেখতে পেলেই এক বা একাধিক পুরুষ-মাকড়সা অপূর্ব ভঙ্গিতে নৃত্য শুরু করে দেয় । একাধিক পুরুষ-মাকড়সা একটা স্ত্রী-মাকড়সার কাছে নৃত্য শুরু করলেই পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বেধে যায় । ঝগড়ার ফলে একটি মাত্র পুরুষ ছাড়া আর সকলকেই বিতাড়িত হতে হয় । স্ত্রী-মাকড়সাটা কিন্তু এই ঝগড়ায় কোনো অংশগ্রহণ করে না । বরং মনে হয় যেন পরম আগ্রহ ভরে ঝগড়ার পরিণতি লক্ষ্য করছে । বিজয়ী মাকড়সাটা অতঃপর পরম উৎসাহভরে নাচ শুরু করে দেয় । সে তার সবগুলো পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে ওঠে এবং মুখের সামনে মোচার মতো সুদৃশ্য যন্ত্র দু'টিকে যতদূর সম্ভব দু'দিকে প্রসারিত করে হাত জোড় করবার ভঙ্গিতে পুনরায় একত্রিত করে । এ অবস্থায় ক্রমশ নিচু হ'তে হ'তে একেবারে মটির উপর লেপ্টে বসে পড়ে । বার বার এরূপ করতে করতে এক-পা পেছিয়ে, দু'পা এগিয়ে স্ত্রী-মাকড়সার চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করতে থাকে । মনে হয়, ঠিক যেন পূর্বেকার আমলের নবাব-বাদশাদের দরবারে কুর্নিশ করবার কায়দা । স্ত্রী-মাকড়সাটা সর্বক্ষণ প্রায় একই স্থানে চুপ করে বসে থাকে । দেখে মনে হয়, তার যেন এসব ব্যাপারের দিকে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই । কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে নৃত্যরত পুরুষটার দিকে তার কড়া নজর থাকে । প্রায় ঘন্টাখানেকেরও বেশি সময় অক্লান্তভাবে নাচতে নাচতে পুরুষ–মাকড়সাটা ক্রমশ তার বৃত্তাকার পথের পরিধি কমিয়ে আনতে থাকে । স্ত্রী-মাকড়সার কাছ থেকে প্রায় আধ ইঞ্চি তফাতে এসে পড়লেই আরও খুব ঘন ঘন নাচতে শুরু করে । এর মধ্যেই একটু সুযোগ বুঝে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে এসে স্ত্রী-মাকড়সার পিছনের পা স্পর্শ করে । স্ত্রী-মাকড়সা যদি তার নাচে খুশি না হয়ে থাকে তবে পদস্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরে দাঁড়ায় এবং তাকে তাড়া করে । পুরুষটা তখন বিদ্যুৎগতিতে পিছু হটে যায় এবং পুনরায় নতুন করে নাচ দেখিয়ে তাকে খুশি করবার চেষ্টা করে । নাচে খুশি হয়ে থাকলে সে একইভাবে বসে থাকে এবং পদস্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে তার পিছনের পা দু'খানা যেন অতি পুলকে থর থর করে কাঁপতে থাকে। এরূপ অবস্থায় কিছুক্ষণ পরেই উভয়ের মিলন ঘটে । মিলনের পরক্ষণেই স্ত্রী-মাকড়সাটা ভয়ানক উগ্র ভাবে পুরুষটাকে তাড়া করে । পুরুষটাও প্রাণের ভয়ে ছুটে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে । দু'একটা কোনো রকমে আত্মরক্ষা করতে পারলেও এ অবস্থায় অনেকেই স্ত্রীদের হাতে প্রাণ বিসর্জন দিতে বাধ্য হয় । স্ত্রী-মাকড়সা পুরুষটাকে ধরে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে । মাকড়সাগুলোকে পোষবার সময় এরূপ বহু নৃশংস ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি ।

স্ত্রী মেছো-মাকড়সা একসঙ্গে প্রায় ৫০/৬০টা ডিম পাড়ে । ডিমগুলো ঈষৎ হলদে রঙের এবং সর্ষের চেয়ে ছোট । এরা জাল বোনে না বটে, তবে

ডিমগুলোকে রাখবার জন্যে সুতো বুনে মটর-বীজের মতো ছোট ডিমের থলি তৈরি করে। ডিমগুলো তার মধ্যে সযত্নে রক্ষিত থাকে। সুতো দিয়ে ডিমের থলিটাকে শরীরের পশ্চাভাগে দৃঢ়ভাবে আটকে রেখে স্ত্রী-মাকড়সা স্বচ্ছন্দে ঘোরাঘুরি করে বেড়ায়। দিন দশ-পনেরো পরে ডিম ফুটে বাচ্চাগুলো বেরিয়ে এসেই মায়ের পিঠের উপর আশ্রয় গ্রহণ করে। সংকীর্ণ স্থানে অতগুলো বাচ্চার ঠেসাঠেসি করেও স্থান সঙ্কুলান হয় না, কাজেই একদলের উপর অপর দল উঠে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকে। বাচ্চাগুলোকে পিঠে করে স্ত্রী-মাকড়সা স্বচ্ছন্দ গতিতেই সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়। কোনো কারণে ভয় পেলে বাচ্চাগুলোকে নিয়েই জলের নীচে
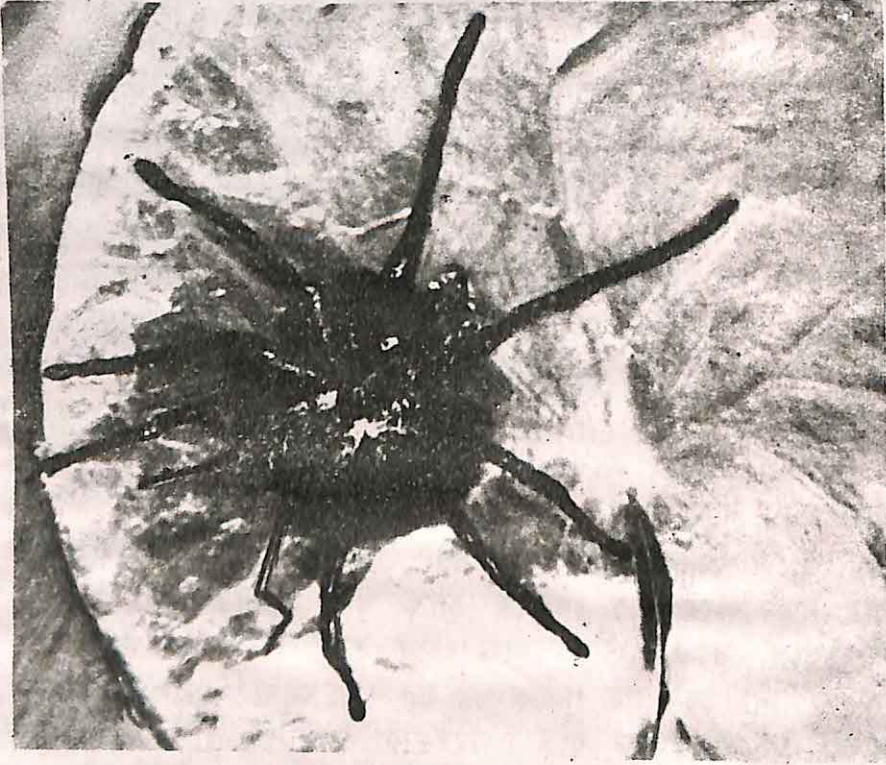
মেছো-মাকড়সাদের মিলনের প্রথম অবস্থা

আত্মগোপন করে। ছয়-সাত দিন পরেই বাচ্চাগুলো ক্রমে ক্রমে মায়ের পিঠ ছেড়ে নেমে পড়ে এবং স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে থাকে। বার পাঁচেক খোলস বদল করে বাচ্চাগুলো ক্রমশ বড় হয়ে ওঠে। ডুবুরী মাকড়সার বাচ্চাদের হাল-চাল পর্যবেক্ষণ করবার উদ্দেশ্যে বাচ্চাসমেত একটা স্ত্রী-মাকড়সাকে বড় একটা কাচের জারের মধ্যে রেখেছিলাম। ইচ্ছে করেই তার খাবার কোনো ব্যবস্থা করিনি।

স্ত্রী-মাকড়সাটা কাচের গা বেয়ে পালিয়ে যাবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বাচ্চাসমেত ভারী দেহ নিয়ে কাচের মসৃণ গা বেয়ে উঠতে পারেনি। দিন তিনেক পর বাচ্চাগুলো একে একে মায়ের পিঠ থেকে জারটার মধ্যেই ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ল। দেখলাম খুদে খুদে বাচ্চাগুলো অনায়াসেই কাচের গা বেয়ে উপরের দিকে উঠে আসছে। কতকগুলো মায়ের আশেপাশেও ঘুরে বেরাচ্ছিল। এক সময়ে দেখলাম হঠাৎ মা তার গোটা তিনেক বাচ্চাকে ধরে চিবিয়ে খেয়ে ফেললো। এ দৃশ্য দেখে স্ত্রী-মাকড়সাটাকে জলের চৌবাচ্চায় ছেড়ে দিলাম। বাচ্চাগুলো জারটার মধ্যেই রইল। সেটা ল্যাবরেটারির টেবিলের উপর রেখে কিছুক্ষণের জন্যে অন্যত্র গিয়েছি, ফিরে এসে দেখি—জারটা শূন্য, একটা মাকড়সার বাচ্চাও তাতে নেই। প্রায় ৬০/৭০টা বাচ্চা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল! হঠাৎ নজর পড়লো দেয়ালের একটা কোণে। বাচ্চাগুলো যেন সুতোয় গাঁথা মালার মতো দেয়ালের কোণটাতে ঝুলছে। কী করে সবগুলো বাচ্চা ওখানে গেল?

একটু অনুসন্ধান করতেই বুঝতে পারলাম আমি যাওয়ার পর টেবিল ফ্যানের হাওয়াটা সোজাসুজি জারটার ওপর পড়ছিল। তাতেই এ কান্ডটি ঘটেছে। কৌশলটা দেখবার জন্যে বাচ্চাগুলোকে আবার জারের মধ্যে রেখে, টেবিল ফ্যানটাকে আস্তে চালিয়ে দিলাম। আশ্চর্য ব্যাপার! হাওয়া লাগতেই বাচ্চাগুলো একে একে জারটার কানার উপর এসে জড়ো হতে লাগল। কানার উপর উঠেই তারা তাদের শরীরের পিছন দিকটাকে উঁচু করে খুব সূক্ষ্ম সুতো বার করতে শুরু করল। সুতোটা হাওয়ার টানে বেশ কিছুটা লম্বা হয়ে গেলেই প্রত্যেকটা বাচ্চা তার পাগুলোকে আলগা করে সঙ্গে সঙ্গেই সুতোয় ভর করে প্যারাশ্যুটের মতো হাওয়ায় ভেসে গেল।

# চামচিকা-শিকারী মাকড়সা

কলকাতার খুব কাছেই কৃষ্টপুর নামে একটা গ্রাম আছে [ পঞ্চাশ বছর আগে ]। মাঝে মাঝে প্রায়ই এ গ্রামে পোকা-মাকড় সংগ্রহ করতে যেতাম । গাঁয়ের ছেলেরা অনেকেই পরম উৎসাহে নানারকম পোকা-মাকড় সংগ্রহ করে দিতো । একদিন একটা মাঠের ধারে জঙ্গলের মধ্যে পোকা-মাকড় সংগ্রহ করছিলাম । সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে । একটা ছেলে ছুটে এসে বললো—দেখুন এসে—কী একটা অদ্ভুত কান্ড ! ব্যাপার কি জানতে চাওয়ায় সে কিছু দূরে একটা গোয়াল-ঘর দেখিয়ে বললো—শিগগির চলুন, ওখানে গিয়েই দেখবেন । জিনিসপত্র তুলে নিয়ে দ্রুতপদে ছেলেটির পিছন পিছন গেলাম । ঘরটার কাছাকাছি আসতেই ভিতরের দিক থেকে একটা কিচির-মিচির আওয়াজ শোনা গেল । ঘরটার প্রায় তিনদিক দরমা দিয়ে ঘেরা । ভিতরে ঢুকেই দেখি—চালের বাখারির নীচেই দরমার গায়ে একটা ধূসর রঙের
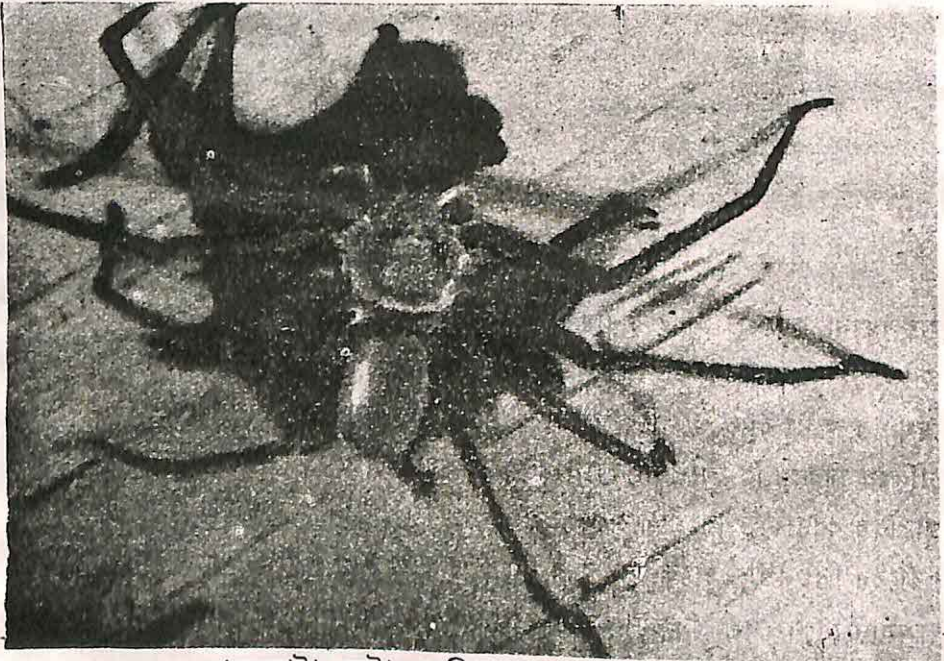
মাকড়সাটা একটা চামচিকার ঘাড় কামড়ে ধরেছে

মাকড়সা কী একটা প্রাণীকে কামড়ে ধরেছে । থেকে থেকে সেটা কিচির-মিচির করে চেঁচিয়ে উঠছে । ঘরের ভিতর অল্প আলোতে ভালো দেখা যায় না । টর্চের আলো ফেলতেই দেখা গেল, মাকড়সাটা কালো রঙের শিকারটাকে বাখারির নীচ থেকে টেনে বার করবার চেষ্টা করছে । শিকারটাও বাখারির নীচে সম্পূর্ণরূপে আত্মগোপন করবার চেষ্টা করছে । টর্চের আলো পড়তেই আক্রান্ত প্রাণীটা বোধ হয় হঠাৎ চমকে গিয়েই আবার প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলো এবং প্রবলবেগে ঝাপটা-ঝাপটি করে বাখারির নীচ থেকে খানিকটা বেরিয়ে এল । সঙ্গে সঙ্গে একটা ডানা বেরিয়ে পড়তেই বোঝা গেল—শিকারটা ছোট্ট একটা চামচিকা ছাড়া আর
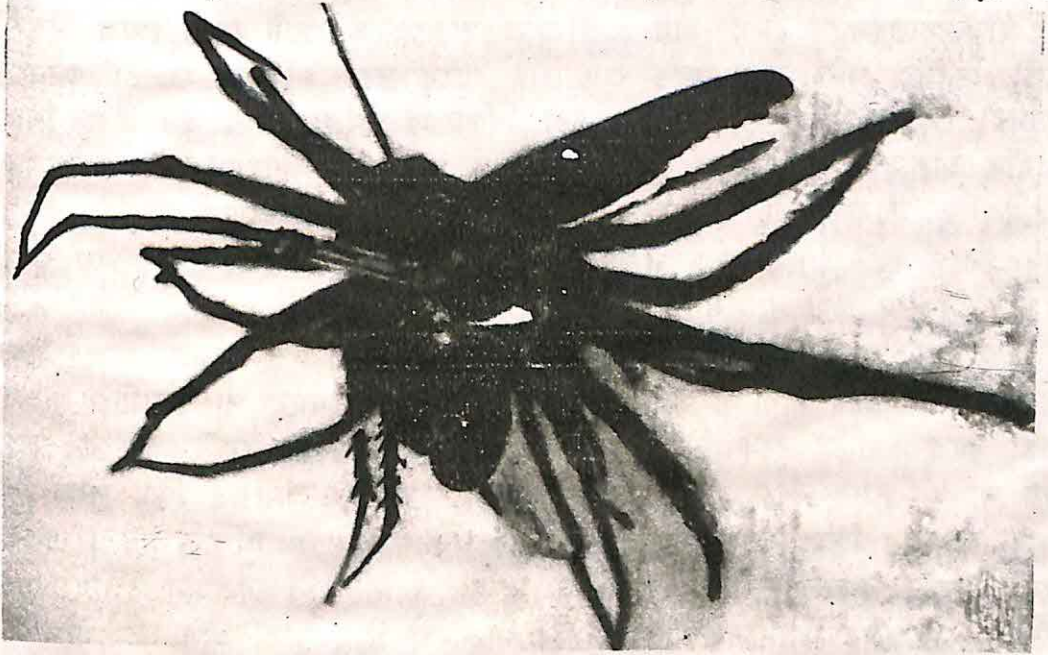
মাকড়সাটা আরশোলার ঘাড় কামড়ে ধরেছে

কিছুই নয় । বাখারির নীচ থেকে মাথাটা বার করতেই মাকড়সাটা তার ঘাড় কামড়ে ধরলো । চামচিকাটার তখন কি চিৎকার ! বাখারির নীচে ঢুকে যাওয়ার ফলেই চামচিকাটা ভয়ানক বেকায়দায় পড়েছিল, নচেৎ হয়তো এক ঝটকা মেরেই মাকড়সাটাকে ফেলে দিয়ে উড়ে যেতে পারতো । মাকড়সাটা ঠিক একই ভাবে চামচিকার ঘাড় কামড়ে পড়ে আছে । অনেক চেষ্টায় হামাগুড়ি দিয়ে চামচিকাটা দরমার উপর একটা সমতল জায়গায় এসে পড়লো, কিন্তু তার কন্ঠস্বর ক্রমেই যেন ক্ষীণ হয়ে আসছিল । মাকড়সাটা তখনও তার পিঠের উপর চেপে বসে আছে । টর্চের আলোতে ক্যামেরায় কয়েকটা 'এক্সপোজার' দিয়ে নিলাম । শেষপর্ব সমাধা হতে বেশ সময় লাগবে ভেবে শিকার সমেত মাকড়সাটাকে ধরে আনবার

ব্যবস্থা করতে হলো । গ্লাসের মতো বড় একটা কাচপাত্র উপুড় করে খুব সন্তর্পণে মাকড়সাটাকে চাপা দিয়ে একখানা পাতলা কাচ ধীরে ধীরে তার নীচে ঢুকিয়ে দিলাম । এভাবে চামচিকা সমেত মাকড়সাটাকে বন্দী করে এনে পরীক্ষাগারে রেখে গেলাম । পরের দিন এসে দেখি—চামচিকাটা মরে শক্ত হয়ে গেছে । মাকড়সাটা কাচপাত্রের গায়ে চুপটি করে বসে আছে । আনবার সময় ঝাঁকুনি লাগায় মাকড়সাটা শিকারটাকে ছেড়ে দিয়েছিল— একারণেই বোধ হয় সে আর শিকারকে স্পর্শ করেনি ।

বাংলা দেশের প্রায় সব জায়গাতেই ঘরের দেয়ালে, আসবাব-পত্রের আড়ালে এই মাকড়সাগুলোকে দেখা যায় । স্ত্রী-মাকড়সাগুলোকে ছোট ছোট গোল বিস্কুটের মতো ডিমের থলি বুকে করে দেয়ালের গায়ে বসে থাকতে হয়তো অনেকেই তোমরা দেখেছ । রাতের বেলায় এরা শিকারের খোঁজে বার হয় এবং শিকার ধরবার আশায় এক জায়গায় চুপটি করে বসে থাকে । সাধারণত এরা আরশোলা, উইচ্চিংড়ি, কাঁকড়া-বিছা প্রভৃতি শিকার করে থাকে । শিকার দেখতে পেলেই বিদ্যুৎবেগে ছুটে গিয়ে ঘাড় কামড়ে ধরে বিষ ঢেলে দেয় । অল্পক্ষণের মধ্যেই শিকার নিস্পন্দ হয়ে পড়ে ।

এই মাকড়সারা ভয়ানক ঝগড়াটে । কোনো কারণে দু'জন দেখা হলেই ঝগড়া বেধে যায় । তবে সাধারণ অবস্থায় প্রায়ই এরা একে অন্যকে পাশ কাটিয়ে চলবার চেষ্টা করে । ডিম বুকে নিয়ে চলবার সময়ে কিন্তু সহজে কেউ কাউকে রেহাই দেয় না । এদের কাছে ডিম অতি মূল্যবান সম্পত্তি । নিজের ডিম রক্ষা করা অথবা অপরের ডিম কেড়ে নেবার জন্যে এরা প্রাণ দিতেও কুন্ঠিত নয় । একবার এদের একটা গুরুতর লড়াই দেখবার সুযোগ ঘটেছিল । একদিন হঠাৎ নজরে পড়লো—দেয়ালের কার্নিশের নীচে দু'টো মাকড়সা ডিম বুকে করে মুখোমুখি বসে আছে । উভয়ের মধ্যে ব্যবধান ফুটখানেকের বেশি হবে না । কতক্ষণ এরা এভাবে বসে ছিল জানি না । কিছুক্ষণ পরে একটা মাকড়সা তার সামনের পা-দু'খানা উঁচু করে খানিকটা সামনের দিকে এগিয়ে গেল । অপর মাকড়সাটাও সঙ্গে সঙ্গে সামনের দু'পা উঁচু করে যেন প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো । কিছুক্ষণ চুপচাপ, কেউ আর এগোয় না । প্রথমে যেটা এগিয়ে ছিল এবার সে আরও খানিকটা যেতেই অপর মাকড়সাটা দু'পা পিছিয়ে গেল; কিন্তু পরক্ষণেই আবার এগিয়ে এল । দু'তিন মিনিটের মধ্যেই উঁচুকরা পায়ে পা ঠেকিয়ে উভয়ের মধ্যে লেগে গেল ঠেলাঠেলি। একবার এ ওকে পিছু ঠেলে আবার ও তাকে পিছু ঠেলে । দু'এক মিনিট মাত্র এরূপ ঠেলাঠেলি চললো; তারপর উভয়ে আবার পৃথক হয়ে গিয়ে চুপ করে রইল । চার-পাঁচ মিনিট চুপ করে থাকবার পর আবার লড়াই শুরু হয়ে গেল । এবার

শুধু ঠেলাঠেলি নয়—দু'জনে দস্তুরমত জড়াজড়ি, কামড়া-কামড়ি চলতে লাগলো। নীচে কানা-উঁচু একটা চওড়া এনামেলের পাত্র পড়ে ছিল। জড়াজড়ি করে মাকড়সা দু'টো উপর থেকে সেই পাত্রটার মধ্যে পড়ে গেল। এত উঁচু থেকে পড়া সত্ত্বেও কারো কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই—জড়াজড়ি কামড়া-কামড়ি সমানভাবেই চলছে। উভয়েই তাদের ডিম শক্ত করে বুকে চেপে আছে। প্রায় ছ'-সাত মিনিট মারামারি চলবার পর একটা মাকড়সার ঠ্যাং ছিঁড়ে গেল। দেখে মনে হলো-সে মাকড়সাটা খুবই কাবু হয়ে পড়েছে। অপর মাকড়সাটা তখন তাকে ছেড়ে তার ডিমটাকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলো; কিন্তু ডিম কি সে সহজে ছাড়ে! ক্লান্ত, বিকলাঙ্গ হয়েও সে প্রাণপণে ডিমটাকে আঁকড়ে ধরে আছে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু ডিমটাকে ছাড়তেই হলো। বিজয়ী মাকড়সাটা তার বুক থেকে ডিমটাকে কেড়ে নিয়ে বগলদাবা করে সরে পড়বার ফিকিরে ছিল; কিন্তু এনামেলের মসৃণ কানা বেয়ে উঠবার উপায় ছিল না বলে সহজেই বন্দী হ'য়ে পড়ল। বন্দী মাকড়সাটাকে যত্ন করে পোষবার ব্যবস্থা করে দিলাম। একটা ডিম বুকে এবং অপরটাকে বগলে চেপেই সে বন্দীশালায় চলা-ফেরা করে বেড়াত। এক মুহূর্তের তরেও ছিনিয়ে-আনা ডিমটাকে তার কাছ-ছাড়া করতে দেখিনি। এই ঘটনার চারদিন পরে বুকের ডিম থেকে আড়াই শ'য়েরও বেশি এবং দিন ছয়েক পরে, ছিনিয়ে-নেওয়া ডিম থেকে প্রায় শ'দুই বাচ্চা বেরিয়ে এলো। বাচ্চাগুলো একসঙ্গে দল বেঁধে থাকে। সেগুলোকে বন্দীশালা হতে মুক্ত করে একটা কাঠের ফ্রেমের উপর ছেড়ে দিলাম। ফ্রেমের উপর থেকে তারা অজস্র সুতো ছেড়ে ঝালরের মতো ঝুলে থাকতো। এলোমেলোভাবে অসংখ্য সূক্ষ্ম সুতোর সাহায্যে তারা ফ্রেম থেকে একটা খুঁটি পর্যন্ত প্রায় দেড়হাত লম্বা, সাত-আট ইঞ্চি চওড়া, একটা সাঁকোর মতো গড়ে তুলেছিল। সাত-আট দিন এভাবে একসঙ্গে থাকবার পর তারা এক-এক করে ক্রমশ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বাচ্চাগুলোর দূরদূরান্তরে ছড়িয়ে পড়বার কৌশল অতি চমৎকার। এরা একটা উঁচু জায়গায় বসে শরীরের পশ্চাদ্ভাগ উঁচু করে সুতো ছাড়তে থাকে। বাতাসে সুতোটা উড়তে থাকে। সুতোটা বেশ একটু লম্বা হলেই পা ছেড়ে দেয়। বাতাসের টানে সুতোসহ সে প্যারাশ্যুটের মতো আকাশ-পথে বহু দূরে চলে যায়। গাছ-পালার গায়ে যেখানে সুতো আটকে যায়, সেখানেই নেমে পড়ে। মাকড়সার কতকগুলো বাচ্চা সংগ্রহ করে ছোট্ট টেবিল-ফ্যানের বিপরীত দিকে কোনো উঁচু জায়গার উপর রেখে দিয়ে অনায়াসেই পরীক্ষা করে দেখতে পারো—কেমন আশ্চর্য উপায়ে তারা হাওয়ায় ভেসে চলে যায়।

# টিকটিকি-শিকারী মাকড়সা

এক সময়ে পরীক্ষাগারে কয়েকটা জাল-বোনা মাকড়সা পুষেছিলাম। চার ফুট চৌকো কাঠের ফ্রেমে তারা জাল বুনে শিকারের প্রতীক্ষায় বসে থাকতো। রোজ দু'একটা করে জ্যান্ত ফড়িং তাদের জালে ফেলে দিতাম। ফড়িং শিকার করে তারা দিব্যি আরামেই বাস করতো। মাকড়সাসমেত এরূপ একটা ফ্রেম একটা ঘরে, দেয়ালের খুব কাছাকাছি ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। জালের মধ্যে একটা ফড়িং ছেড়ে দিয়েছি। জালে আটকে গিয়ে ফড়িংটা পালাবার জন্যে ভয়ানক ঝাপটাঝাপটি শুরু করে দিল। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা লক্ষ্য করছি। ইতিমধ্যে মাঝারি গোছের একটা টিকটিকি দেয়ালের গা বেয়ে ছুটে এসেই
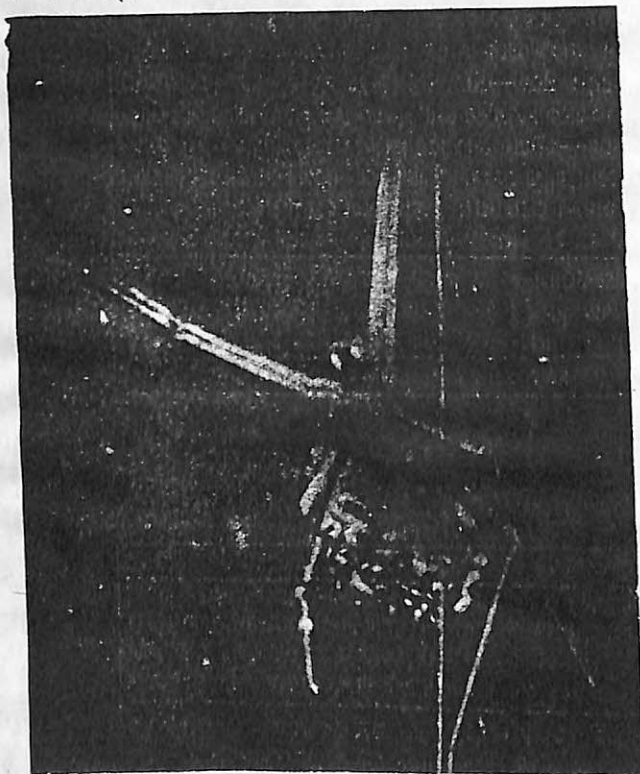
সুতো ছেড়ে মাকড়সা নতুন জালের পত্তন করছে

ফড়িংটাকে লক্ষ্য করে লাফিয়ে পড়ল । জালটা ভয়ানকভাবে আন্দোলিত হওয়ায় ভয় পেয়ে মাকড়সাটা জালের এক কোণে পালিয়ে গেল । জালের বাঁধন ছাড়াবার জন্যে টিকটিকিটা অনেকক্ষণ অবধি ধ্বস্তাধ্বস্তি করে অবশেষে চুপ করে রইল । কিছুক্ষণ বাদেই দেখলাম—মাকড়সাটা একপা দু'পা করে অতি সন্তর্পণে টিকটিকিটার দিকে এগিয়ে আসছে । কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর সে একরকম ছুটে গিয়েই টিকটিকিটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো । টিকটিকিটা সঙ্গে সঙ্গেই একটা ভীষণ ঝাঁকুনি দিয়ে খানিকটা জাল সমেত নীচে পড়ে পালিয়ে গেল । শিকার হাতছাড়া হয়ে যেতে মাকড়সাটা যেন হতভম্বের মতো চুপ করে বসে রইল । অনেকক্ষণ পর এদিক ওদিক তদারক করে জালটাকে মেরামত করতে লেগে গেল । ব্যাপারটা দেখে একটা অদম্য কৌতূহল জাগলো যে মাকড়সা টিকটিকির মাংস খায় কিনা—দেখতে হবে ।

পরীক্ষার জন্যে একটা নতুন রকমের ব্যবস্থা অবলম্বন করলাম । হাতের কনুইয়ের মতো প্রসারিত করে একটা সরু অথচ চ্যাপ্টা কাঠ দেয়ালের গায়ে জুড়ে দিলাম । কনুইয়ের মতো কাঠখানা থেকে প্রায় দু'ইঞ্চি দূরে মাকড়সার জালসমেত একটা ফ্রেম ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। কাঠখানার বিপরীত দিকে, জালের অপর পাশে, জাল থেকে ইঞ্চিখানেক তফাতে মাঝারি গোছের একটা জ্যান্ত ফড়িঙের পায়ে আঠা মাখিয়ে, লম্বা একটা স্ট্যান্ডের গায়ে আটকে দিলাম । বারংবার ডানা কাঁপিয়ে ফড়িংটা উড়ে পালাবার জন্য চেষ্টা করছিল । টিকটিকিরা সাধারণত সন্ধ্যার পরেই শিকারের খোঁজে বেরিয়ে থাকে । কাজেই ঘরের আলো কমিয়ে অপেক্ষা করে রইলাম । অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর কার্নিশের নীচে একটা টিকটিকি দেখা গেল । কিছুক্ষণ ঘোরাফেরার পর ফড়িংটার ডানার শব্দে হয়তো তার সেদিকে নজর আকৃষ্ট হয়েছিল । থেমে থেমে সে ক্রমশই ফড়িংটার দিকে এগুতে লাগলো । ফড়িংটা আবার ডানা নাড়াতেই সে ছুটে এসে কাঠখানার উপর উঠলো; কিন্তু আর এগোয় না,—চুপ করে রইল । কিছুক্ষণ বাদেই ফড়িংটা আবার ঝাপটাঝাপটি শুরু করে দিল । টিকটিকিটা তখন একপা দু'পা করে কাঠখানার শেষ সীমায় এসে হঠাৎ ফড়িংটার দিকে লাফিয়ে পড়ল । মাঝখানে যে মাকড়সার জাল রয়েছে সেটা বোধ হয় তার নজরেই পড়ে নি । ফলে এই হলো যে, টিকটিকিটা আর জাল পেরিয়ে ফড়িংটার কাছে পৌছতেই পারলো না, জালের মধ্যেই তাকে আটকা পড়তে হলো । জাল থেকে পালিয়ে যাবার জন্যে সে ভয়ানক ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু করে দিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না । কেবল জালের খানিকটা অংশ ছিঁড়ে গিয়ে তাতেই আরও জড়িয়ে গেল । কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু করলো; কিন্তু শ্রান্ত হয়ে অবশেষে চুপ করে রইলো । মাকড়সাটা এতক্ষণ জাল

থেকে পালিয়ে গিয়ে ফ্রেমের এককোণে লুকিয়ে ছিল। এবার অবস্থা শান্ত দেখে একপা দু'পা এগিয়ে এসে হঠাৎ টিকটিকিটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং শরীরের পিছন দিক থেকে ফিতার মতো চওড়া সুতোর ফালি বের করে পিছনের দু'পায়ের সাহায্যে টিকটিকিটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ব্যান্ডেজের মতো করে জড়াতে লাগলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই ব্যান্ডেজ করা শেষ হয়ে গেল এবং সেটাকে জালে ঝুলিয়ে রেখে জালের মধ্যখানে গিয়ে, কয়েকবার অপূর্ব ভঙ্গিতে নৃত্য করে, চুপ করে বসে রইল। প্রায় ঘন্টা-দেড়েক বাদে এসে ব্যান্ডেজের পুঁটলিটার মধ্যে দাঁত ফুটিয়ে শিকারের রস-রক্ত চুষে খেতে শুরু করে দিল। পরের দিন সকালে এসে দেখি—টিকটিকির হাড় এবং চামড়ার সামান্য অংশ মাত্র পুঁটলির মধ্যে রয়েছে। টিকটিকির রস-রক্ত চুষে খেয়ে মাকড়সাটা আয়তনে অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছিল। এই বিরাট ভোজের পর কয়েকদিন পর্যন্ত সে আর কোনো খাদ্য স্পর্শ করেনি।

ঘরের আনাচে-কানাচে, বনে-জঙ্গলে ফাঁকা জায়গায় এই মাকড়সাগুলো শিকার ধরবার জন্যে খাড়াভাবে বড় বড় জাল পেতে মধ্যস্থলে সাদা একটা 'ক্রস' চিহ্ন বুনে তার উপরে নিচু দিকে মুখ করে বসে থাকে। মাকড়সাগুলো দেখতেও বেশ সুশ্রী, পিঠের উপর সাদা অথবা হলুদ এবং কালো রঙের ডোরা কাটা। পিছনের পা থেকে সামনের পা পর্যন্ত দৈর্ঘ্যে এরা প্রায় সাড়ে তিন বা পৌনে চার ইঞ্চির মতো হয়ে থাকে। এদের পুরুষগুলো হয় অসম্ভবরকমের ছোট—এক ইঞ্চির বারো বা চৌদ্দ ভাগের একভাগ মাত্র। চেহারা বা গায়ের রং, কোনটাতেই স্ত্রী-মাকড়সার সঙ্গে সাদৃশ্য নেই। এই জাতের স্ত্রী-মাকড়সারাই কেবল জাল পেতে শিকারের আশায় বসে থাকে। এদের জাল তৈরি করবার কৌশল দেখলে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেতে হয়। প্রায় আধঘন্টা কি কিছু বেশি সময়ের মধ্যেই নিখুঁতভাবে অতি সুন্দর জাল বুনে ফেলে। কিন্তু অতটুকু একটা ক্ষুদ্র প্রাণীর পক্ষে প্রায় দশ-বারো হাত তফাতে এক গাছ থেকে আর এক গাছে সর্বপ্রথম কেমন করে সুতোর যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়? দু'এক মিনিটের মধ্যেই কিন্তু অতি অদ্ভুত উপায়ে তারা এরূপ সংযোগ সাধন করে থাকে। গাছের পাতার সঙ্গে সুতো আটকে মাকড়সাটা প্রথমে খানিকটা নীচে ঝুলে পড়ে। ঝুলে থেকেই বাতাসের মধ্যে সুতো ছাড়তে থাকে। হাওয়ার টানে ঝুলে সুতোটা ক্রমশ বাড়তে বাড়তে যতদূরেই হোক অপর একটা গাছ বা অন্য কিছুতে বেধে যায়। সুতোটার অপর প্রান্ত এভাবে আটকে গেলেই মাকড়সা সেই সুতো বেয়ে অন্যগাছে চলে যায়। সেখান থেকে ঝুলে পড়ে খানিক দূরে অন্য কোনো একজায়গায় সুতো আটকে দিয়ে আগের সুতোটা অবলম্বন করে সুতো ছাড়তে ছাড়তে প্রথম জায়গায় ফিরে আসে। এভাবে একটা প্রকান্ড ত্রিকোণ সুতোর কাঠামো গড়ে ওঠে। তারপর মধ্যস্থলে

ছাতার শলার মতো অনেকগুলো সুতোর টানা দিয়ে ঘুরে ঘুরে জাল বুনে ফেলে।

এই মাকড়সাগুলো ঝগড়াটে হলেও তাদের পরস্পরের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ খুব কমই ঘটে। তবে সময় সময় দেখা যায়—কেউ কেউ অন্যের তৈরি জাল দখল করবার উদ্দেশ্যে কোনো জালের মালিকের উপর চড়াও হয় এবং জালের মালিককে তাড়িয়ে দিয়ে নিজে তার স্থান দখল করে বসে।

জাল দখলের জন্যে কারোর আক্রমণের সম্ভাবনা দেখতে পেলেই মাকড়সা ক্ষিপ্রগতিতে তার জালের টানাগুলো কেটে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই সুতোগুলো গুটিয়ে ছোট্ট একটা ডেলার মতো করে ফেলে। সময় না পেলে অবশ্য আততায়ীর সঙ্গে লড়াই করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। জাল গুটিয়ে ফেলবার সুযোগ পেলে সুতোর ডেলাটাকে বুকে চেপে অন্যত্র চলে যায় অথবা আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে থাকে।

মাকড়সার জাল শিকার ধরবার ফাঁদ ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে তারা যে জাল পেতে তার মধ্যিখানে বসে থাকে সেটা কতকটা বিশ্রামের ব্যাপার হলেও প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে—জালে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই শিকার আয়ত্ত করা। জালের সুতোর গায়ে বিন্দু বিন্দু কতকগুলো আঠালো পদার্থ থাকে। একটা ম্যাগ্নিফাইয়িংগ্লাস জালের সামনে ধরলেই দেখতে পাবে—ছোট ছোট মার্বেলের গুলির মতো কতকগুলি গোলাকার পদার্থ প্রত্যেকটা সুতোর গায়ে মালার মতো সাজানো রয়েছে। কোনো কিছু জালের মধ্যে পড়লেই এই আঠায় আটকে যায়। তখন জালে দু'তিনদিন পর্যন্ত জাল পাতা থাকলেই এই আঠা শুকিয়ে যায়। তখন জালে শিকার পড়লেও আর আটকায় না। একারণেই মাকড়সারা দু'তিন দিন পর পরই নতুন জাল তৈরি করে। বড় শিকার জালে পড়লে অনেক সময় জাল ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তখন কিন্তু তারা নতুন জাল তৈরি না করে সেই জালটাকেই মেরামত করে নেয়। মেরামতের বুনানি অনেক ক্ষেত্রেই পুরানো বুনানির সঙ্গে মিশ না খেলেও তাতে শিকার ধরবার কোনো অসুবিধা হয় না।

# নেকড়ে-মাকড়সা

কিছুকাল আগে দুপুর বেলা একদিন বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজ থেকে বেরিয়ে আসছি,–গেটের সামনে বাগানের অর্ধবৃত্তাকার বেড়াটার উপর নজর পড়তেই দেখি–খুদে পিঁপড়েদের একটা লম্বা সার চলেছে। লাইন প্রায় ২৫/৩০ হাতের কম হবে না। কতকগুলো পিঁপড়ে এদিকে আবার কতকগুলো ওদিকে, ডিম এবং খাবার মুখে করে ব্যস্তভাবে যাতায়াত করছে। মাঝে মাঝে লাইনের মধ্যে কালো রঙের লম্বাটে দু'একটা অদ্ভুত ধরনের পোকা ঢেউখেলানোর ভঙ্গিতে পিঁপড়েদের সঙ্গে একদিক থেকে আর একদিকে যাচ্ছিল। তাদের গতি এতই দ্রুত যে, কিছুক্ষণ পর্যন্ত লক্ষ্য না রাখলে চেহারাটা ভালো করে বোঝাই যায় না। লাইনটার একদিক থেকে অন্যদিক পর্যন্ত পোকাগুলোকে অনুসরণ করে চলবার সময় একজায়গায় দেখলাম, ছোট্ট একটা মাকড়সার বাচ্চা পিঁপড়েদের লাইনের ধারে চুপ করে বসে আছে। মনে হলো যেন পিঁপড়ের লাইন পেরিয়ে এগিয়ে যেতে বাধা পেয়েছে। গ্রাহ্যি করবার মতো তেমন কিছু ব্যাপার নয়। আর একটু এগিয়ে যেতেই দেখি–ঠিক একই রকমের আরও দু'টো মাকড়সার বাচ্চা সেই লাইনের পাশেই চুপ করে বসে আছে। এরূপ ক্ষেত্রে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। ব্যাপারটা কী, দেখবার জন্যে দাঁড়িয়ে রইলাম। অল্প কিছুক্ষণ পরেই কয়েকটা পিঁপড়ে সারবন্দিভাবে সাদা-সাদা ডিম মুখে করে যাচ্ছিল। মাঝের মাকড়সাটা হঠাৎ ছুটে গিয়ে একটা পিঁপড়ের মুখ থেকে ডিমটা কেড়ে নিয়ে দু'তিন লাফেই দূরে পালিয়ে গেল। ব্যাপারটা ঘটলো চোখের নিমেষে। লাইনের যে জায়গায় এই রাহাজানিটা ঘটলো সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে একটা হুলুস্থূলু পড়ে গেল। দুর্বৃত্তের সন্ধানে অনেকেই লাইন ছেড়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়লো; কিন্তু তাকে পাবে কোথায় ? সে যে ইতিপূর্বেই অনেক দূরে তাদের নাগালের বাইরে চলে গেছে ! লাইনের শৃঙ্খলা ফিরে আসতে বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল। ইতিমধ্যে লুন্ঠিত খাদ্য উদরসাৎ করে মাকড়সাটা আবার এক পা দু'পা করে এগিয়ে এসে পিঁপড়ের লাইনের ধারে ওৎ পেতে বসে রইলো। প্রায় ঘন্টা দেড়েক সময়ের মধ্যে তিনটে মাকড়সাকেই পিঁপড়েদের মুখের থেকে বার-কয়েক খাদ্য ও ডিম ছিনিয়ে নিতে দেখলাম। এছাড়া, পরে আরও কয়েক জায়গায় এই জাতের বাচ্চা

মাকড়সাগুলোকে পিঁপড়েদের উপর রাহাজানি করতে দেখেছি।

আমাদের দেশে প্রায় সর্বত্র—ঘরের দেয়ালে, বেড়ার গায়ে, ঘরের মেঝের উপর ছোট্ট এক জাতের মাকড়সাকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। পা ছাড়া এদের শরীর লম্বায় প্রায় আধ ইঞ্চির মতো। শরীরের গঠন খুবই দৃঢ়। শরীরের উভয় পার্শ্বে লম্বালম্বি ভাবে এবড়োখেবড়ো মোটা কালো রেখা আছে। পিঁপড়েদের উপর যারা রাহাজানি করে বেড়ায় সে মাকড়সাগুলো এদেরই বাচ্চা। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই লম্বায় প্রায় সমান; কিন্তু পুরুষগুলোকে বেশি সুশ্রী মনে হয়। পুরুষ মাকড়সার দু'পাশে শরীরের কালো রেখা ছাড়াও পিঠের উপর আর একটা মোটা কালো রেখা আছে। এই মাকড়সারা জাল বোনে না; কিন্তু সুতো বুনে আধখানা উবুর করা ডিমের মতো বাসা তৈরি করে। সাধারণত এরা থেমে থেমে দ্রুতগতিতে হেঁটে বেড়ায়; কিন্তু পালাবার সময় লাফিয়ে চলে। এরা অতি হিংস্র প্রকৃতির মাকড়সা; বাঘের মতো কায়দায় শিকার ধরে এবং শিকারকে নির্জন স্থানে বয়ে নিয়ে যায়। এজন্যে এদের নাম হ'য়েছে—নেকড়ে-মাকড়সা। মাছিই এই মাকড়সাগুলোর প্রধান শিকার। ঘরের মেঝেতে মাছি বসতে দেখলেই মাকড়সা অনেক দূর থেকে থেমে থেমে দ্রুত গতিতে তার দিকে অগ্রসর হয়। মাছি থেকে দশ বারো ইঞ্চি তফাতে থাকতেই গতিবেগ কমিয়ে গুঁড়ি মেরে ধীরে ধীরে এগুতে থাকে। মাছিগুলোর স্বভাবই এই যে, কোনো জায়গায় বসলেই পা দিয়ে ঘষে ঘষে শরীর পরিষ্কার করতে লেগে যায়। মাকড়সারা প্রায়ই এই সুযোগে মাছিকে আক্রমণ করে। সাত, আট ইঞ্চি ব্যবধান থেকে মাকড়সা যদি দেখে যে মাছিটা তার দিকে মুখ করে বসে আছে তবে তার দিকে মুখ করেই পাশের দিকে হেঁটে বৃত্তাকারে মাছিটার পিছনে উপস্থিত হয়। তারপর একপা, দু'পা করে অতি সন্তর্পণে আরও কিছুটা এগিয়ে হঠাৎ লাফ মেরে তার ঘাড়ের উপর পড়ে। এদের লক্ষ্য অব্যর্থ। ক্বচিৎ দু'একটা শিকারকে হাতছাড়া হতে দেখেছি। শিকারটাকে ধরেই মুখে করে নিয়ে পালিয়ে যায়। নিরালা জায়গায় এসে রস-রক্ত চুষে খাবার পর আবার শিকারের সন্ধানে ঘুরতে থাকে।

স্ত্রী-ই হোক আর পুরুষই হোক, সমধর্মী দুজনে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেলেই মুস্কিল। এরূপ দেখা হওয়ার ফলে ঝগড়া অবশ্যম্ভাবী। রায়বেঁশেদের লাঠি খেলা দেখেছ তো? ঠিক লাঠালাঠি শুরু হবার আগে, দু'জন লাঠিয়াল বেশ কিছুটা ব্যবধানে মুখোমুখি হয়ে একবার এদিক আবার ওদিক হঠে যেমন করে পায়তাঁরা ভাঁজতে থাকে, এরাও ঠিক তেমনি ভাবে সামনের দু'পা সোজা উঁচু করে পায়তাঁরা কষতে কষতে ক্রমশ এগিয়ে এসে পায়ে পায়ে ঠেকিয়ে দেয়। তারপর শুরু হয় পালোয়ানী কায়দায় ষাঁড়ের লড়াইয়ের মতো অবস্থা। একবার এ ওকে ঠেলে নিয়ে

যায়, আবার ও তাকে ঠেলে নিয়ে যায়। প্রায় পাঁচ-সাত মিনিট এরূপ ঠেলাঠেলি চলবার পর দু'জনে জড়াজড়ি করে কামড়া-কামড়ি শুরু করে দেয়। ষাঁড়ের লড়াইতে যেমন পরাজিত পক্ষ, গাড়ি ঘোড়া, লোকজন—যা কিছু বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করে লেজ উঁচিয়ে ছুটতে থাকে, এই মাকড়সাগুলোর লড়াইতেও কতকটা সে রকম অবস্থাই দেখতে পাওয়া যায়। পরাজিত মাকড়সাটা এক বা একাধিক ঠ্যাং বিসর্জন দিয়ে প্রাণপণে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে অদৃশ্য হয়ে যায়। ঠ্যাং ছিঁড়ে গেলেও এরা যে, কোনো গুরুতর রকমের যন্ত্রণা অনুভব করে তেমন কিছু মনে হয় না। ঠ্যাং ছিঁড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই এক রকম রস নির্গত হয়; অল্পক্ষণের মধ্যেই রসটা জমে গিয়ে ক্ষতমুখ বন্ধ করে দেয়। কিছুদিন পর সেই কর্তিত স্থানে আবার নতুন ঠ্যাং গজিয়ে থাকে।

এরা খুবই সাবধানী মাকড়সা। চলবার সময় চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলে। পিছন দিকেও আলোছায়ার কিছুমাত্র পরিবর্তন লক্ষ্য করলেই তৎক্ষণাৎ ঘুরে দাঁড়ায়। জালবোনা মাকড়সাদের স্বভাব এর বিপরীত। তাদের দৃষ্টিশক্তি যেন খুব সীমাবদ্ধ। চলবার সময় কিছুদূর অন্তর অন্তর সুতো আটকে যায়। হঠাৎ কোনো উঁচু জায়গা থেকে ছিটকে ফেললেও মাটিতে পড়ে যাবে না; সুতোর সঙ্গে ঝুলে থাকবে। কয়েক জাতের কুমোরে-পোকা এদের ভয়ানক শত্রু। কুমোরে-পোকা এদের দেখতে পেলে আর রক্ষা নেই। যেমনি করে, যতক্ষণেই হোক, ধরে ফেলবেই। কুমোরে পোকা মাকড়সার নাগাল পেলেই তার শরীরে হুল ফুটিয়ে বিষ ঢেলে দেয়। এই বিষের ক্রিয়া অদ্ভুত। বিষে মাকড়সার মৃত্যু ঘটে না; কিন্তু কিছুদিনের জন্য অসাড় হয়ে যায়। বাচ্চাদের খাওয়াবার জন্যে কুমোরে-পোকা মাকড়সাগুলোকে অসাড় করে মাটির বাসার গর্তের মধ্যে রেখে দেয়। কুমোরে-পোকার আগমন টের পেলেই মাকড়সা লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে গিয়ে কোনো কিছুর আড়ালে আত্মগোপন করে। সুবিধা পেলে বাসার মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং দরজার মুখটাকে ভিতর থেকে টেনে বন্ধ করে রাখে। কুমোরে-পোকাও ভিতরে ঢোকবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকে। অবশেষে কুমোরে-পোকাটা যখন ঢোকবার জন্যে বাসার মধ্যে মুখ প্রবেশ করিয়ে দেয়, তখনই মাকড়সাটা অপর দিকের দরজা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতেও রক্ষা না পেলে মড়ার মতো ভান করে পড়ে থাকে।

# পিঁপড়ে-মাকড়সা

বেলেঘাটা অঞ্চলে একটা ঝোপের মধ্যে ব্যাঙের ছাতা সংগ্রহ করছিলাম । আশে পাশে বেশ ফাঁকা জায়গা । ফাঁকা জায়গাটার একশাশে ডেঁয়ো-পিঁপড়ের গর্ত । কালো রঙের ডেঁয়ো-পিঁপড়েগুলো আমার আশে পাশে আনাগোনা করছে । বিশেষ পরিচিত জীব—পরিচিত তাদের কাজ-কারবার । তবুও বসে বসে খানিকক্ষণ তাদের আনাগোনা লক্ষ্য করছিলাম । হঠাৎ আমার সামনে, প্রায় হাতদেড়েক দূরে,
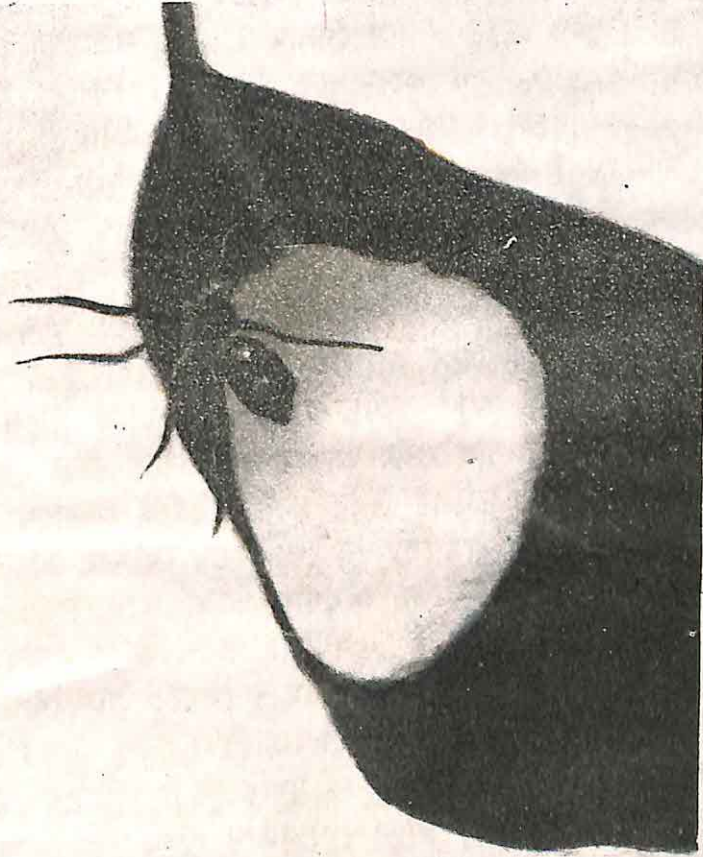
নালসো-পিঁপড়ে অনুকরণকারী আর একজাতের মাকড়সা সুতো বুনে পাতার উপরে বাসা তৈরি করছে

ঝোপটার একটা পাতার উপর কোথা থেকে যেন একটা ডেঁয়ো-পিঁপড়ে বেরিয়ে এলো । আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পিঁপড়েটা পাতার উপর উঠেই হঠাৎ আমায় দেখে যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেল । একটুও নড়ন-চড়ন নেই । আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে । পিঁপড়েটার রকম-সকম দেখে অবাক হয়ে গেছি । কখনওতো কোনো পিঁপড়ের এরূপ অদ্ভুত ভঙ্গি দেখিনি । পিঁপড়েটাকে ধরবার চেষ্টা করতেই বিদ্যুৎগতিতে সে যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল তার কোনো হদিশই মিললো না । মনে একটা অস্বস্তি নিয়ে ফিরে এলাম । এই ঘটনার অনেক কাল পরে, দুপুর বেলা একদিন শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনস্এর মধ্যে মাঝারি গোছের একটা গাছের উপর লাল পিঁপড়েদের (নালসো-পিঁপড়ে) বাসা বাঁধবার কৌশল লক্ষ্য করছি। হঠাৎ নজরে পড়লো, একটা পাতার উপর একটা নালসো-পিঁপড়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঘোরাফেরা করছে । চলা-ফেরার ভঙ্গিটা মোটেই পিঁপড়ের মতো নয় । ভালো করে দেখবার জন্যে আর একটু এগিয়ে গেলাম । একটু নড়াচড়া দেখেই পিঁপড়েটা বিদ্যুৎগতিতে আমার দিকে মুখ করে ঘুরে দাঁড়াল । কোনো জাতের পিঁপড়েই এরূপ করে না । মনে পড়ল—আগের দেখা সেই কালো পিঁপড়েটার কথা; সেটারও ভাবভঙ্গি ঠিক এ ধরনেই ছিল । সেটা ছিল কালো ডেঁয়ো-পিঁপড়ের মতো আর এটা লাল নালসো-পিঁপড়ের মতো দেখতে । স্থির করলাম, যেমন করেই হোক, পিঁপড়েটাকে ধরে রহস্যটা জানতে হবে । কিন্তু ধরা সহজ নয়; কাছে যেতেই নিমেষের মধ্যে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেল । তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও সন্ধান পাওয়া গেল না । হতাশ হয়ে ক্ষুণ্ণ মনে লাল-পিঁপড়েদের সমরোহই দেখতে লাগলাম । কিন্তু মন পড়ে আছে সেই অদ্ভুত প্রাণীটার উপর । মাঝে মাঝে সে জায়গাটার দিকে চেয়ে দেখছি—যদি দৈবাৎ সেটা আবার আত্মপ্রকাশ করে । ঘটলোও তাই । পাতার আড়ালে একটা সরু ডালের উপর প্রাণীটা হেঁটে বেড়াচ্ছে । প্রজাপতি-ধরা জালের লম্বা কাঠের বাঁটটার সাহায্যে দূর থেকে ভয় দেখিয়ে আস্তে-আস্তে সেটাকে গাছের গুঁড়িটার গায়ে একটা ফাঁকা জায়গায় তাড়া করে নিয়ে এলাম । এবার আর অদৃশ্য হয়ে যাবার উপায় নেই । সহজেই তখন তাকে পোকা-মাকড় ধরবার কাচের টিউবের সাহায্যে বন্দী করে ফেললাম । দেখতে লাল-পিঁপড়ের মতো বটে; তবে আকৃতিগত কিছু কিছু খুঁটিনাটি পার্থক্য আছে । কিন্তু মুখের দিকটা পিঁপড়ের মতো নয় । বিশেষ করে চোখের পার্থক্য সুপরিস্ফুট। মোটরের যেমন হেড-লাইট থাকে, কপালের উপর তেমনি দু'জোড়া গোলাকার চোখ যেন জ্বল্‌জ্বল্‌ করছিল । পরীক্ষাগারে নিয়ে এসে মাইক্রোস্কোপের নীচে পরীক্ষা করতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা গেল । প্রাণীটা পিঁপড়ে নয় মোটেই—একটা মাকড়সা মাত্র; লাল-পিঁপড়েকে হুবহু অনুকরণ করেছে । চোখের সংখ্যা চারটে নয় আটটা । পা-ও আটখানা;

কিন্তু সামনের দুখানা পা ঠিক পিঁপড়ের শুঁড়ের অনুকরণে উঁচু করে রাখে। শরীরের পশ্চাদ্ভাগে সুতো বোনবার যন্ত্র রয়েছে। পিঁপড়েদের মতো মাথা ও বুক আলাদা নয়, একসঙ্গে জোড়া। প্রকৃতির রাজ্যে এরূপ নিখুঁৎ অনুকরণ কেমন করে সম্ভব হলো—সে এক মহাসমস্যার কথা। যাহোক, পিঁপড়ে-মাকড়সাটাকে সেদিনের মতো টিউবে করে ল্যাবরেটারিতে রেখে দিলাম। পরের দিন গিয়ে দেখি—একটা অদ্ভুত কান্ড ঘটেছে। টিউবের মধ্যে আগের দিনের সেই মাকড়সাটা নেই। রয়েছে, সম্পূর্ণ নতুন রকমের ভীষণদর্শন অদ্ভুত একটা প্রাণী। দেখলেই মনে হয় যেন দু'টো লাল-পিঁপড়ে লম্বালম্বিভাবে একত্রে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। একটু লক্ষ্য
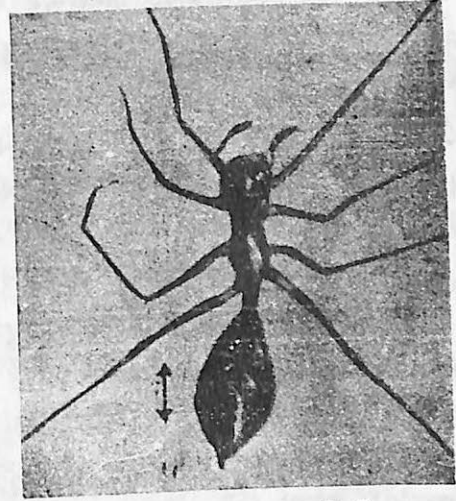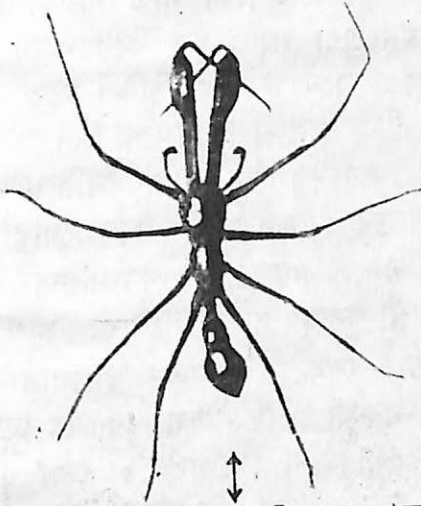
নালসো-পিঁপড়ে অনুকরণকারী পুরুষ-মাকড়সা

নালসো-পিঁপড়ে অনুকরণকারী স্ত্রী-মাকড়সা

করতেই দেখা গেল—দু'টো নয় একটা মাকড়সাই বটে; কিন্তু তার ঠোঁট দু'টো একজোড়া মুগুরের মতো অসম্ভব রকমের বেড়ে গেছে। মুগুরের মাথা থেকে বাউলি-সাঁড়াশীর মতো বাঁকানো লম্বা সুচের মতো যন্ত্র বেরিয়েছে। এই সূক্ষ্মযন্ত্র দু'টো মুগুরের নীচের দিকে খাঁজের মধ্যে ভাঁজ করা। মুগুরের ডগা থেকে শরীরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত প্রাণীটা আগেকার পিঁপড়ে-মাকড়সাটার প্রায় দ্বিগুণ হবে। কোথা থেকে, কেমন করে এটা টিউবের মধ্যে আসলো আর আগের মাকড়সাটাই বা কোথায় কিছুই স্থির করা সম্ভব হলো না। কৌতূহল অদম্য হয়ে উঠলো। রহস্যটা উদঘাটন করতেই হবে। মাকড়সাটা যেখানে ধরা পড়েছিল সেখানটায় জোড় অনুসন্ধান চালাতে লাগলাম। সাধারণত লাল-পিঁপড়েরা যেখানে আনাগোনা করে সেখানেই এদের আস্তানা। অনেক দিনের চেষ্টায় গুটিকয়েক লাল-মাকড়সা ধরে এনে বড় কাচের ঘরে স্বাভাবিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে পুষতে আরম্ভ করলাম। প্রায় বছর তিনেক পোষবার ফলে এদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর অনেক রহস্যই জানা

সম্ভব হয়েছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন জাতের অনেক পিঁপড়ে-মাকড়সারই সন্ধান পেয়েছি।

আমদের এই বাংলাদেশেই বিভিন্ন জাতের অসংখ্য রকমারি পিঁপড়ে-মাকড়সা দেখা যায়। একমাত্র কলকাতা শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকেই অনেক রকমের বিভিন্ন জাতের পিঁপড়ে-মাকড়সা সংগ্রহ করেছি। কোনো কোনো পিঁপড়েকে একাধিক বিভিন্ন জাতের মাকড়সা অনুকরণ করে থাকে। আরও বিস্ময়ের কথা এই যে, এদের বাচ্চাগুলো আবার বিভিন্ন রকমের খুদে-পিঁপড়েকে অনুকরণ করে চলে। পিঁপড়ে-মাকড়সাদের স্ত্রী এবং পুরুষের আকৃতি বিভিন্ন; কিন্তু গায়ের রং একই রকম। পুরুষগুলোর মুগুরের মতো প্রকান্ড দু'টো ঠোঁট বেরিয়ে থাকে। মুগুর দু'টোর ভিতরের দিকে করাতের দাঁতের মতো অসংখ্য দাঁত সারবন্দিভাবে সাজানো। কুমিরের মতো প্রকান্ড হাঁ করে যখন এরা লড়াই শুরু করে তখন খুবই ভয়ঙ্কর দেখায়। স্ত্রী-মাকড়সা পাতার গায়ে সুতো বুনে রুপোর সিকির মতো ছোট্ট বাসা তৈরি করে এবং তাতে পনেরো-বিশটা ডিম পাড়ে। আট-দশ দিন পরে ডিম ফুটে খুদে পিঁপড়ের মতো বাচ্চা বেরিয়ে আসে। ডিম থেকে বেরিয়ে এসেই বাচ্চাগুলো তাদের মতো চেহারার খুদে-পিঁপড়ের দলের আশেপাশে ঘোরাফেরা করতে শুরু করে। সর্বসমেত ৫।৬ বার খোলস বদলে এরা ক্রমশ পূর্ণ-পরিণতি লাভ করে। পঞ্চম বার খোলস বদলাবার পরেও স্ত্রী-পুরুষ পার্থক্য বোঝা যায় না। সবাইকার আকৃতি-প্রকৃতিই স্ত্রী-মাকড়সার মতো। শেষবার খোলস ছাড়বার সময় পুরুষেরা স্ত্রী-মাকড়সার আকৃতি পরিবর্তন করে প্রকাণ্ড ঠোঁটওয়ালা পুরুষের আকৃতি পরিগ্রহণ করে। টিউবের মধ্যে যে অন্য রকমের মাকড়সা দেখেছিলাম, শেষ বারের মতো খোলস বদলানোই তার কারণ। মাত্র পনেরো-বিশ মিনিট সময়ের মধ্যেই আপাতপ্রতীয়মান স্ত্রী-মাকড়সা পুরুষের রূপ ধরে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

এখানে বড় করে মাত্র দু' জাতের পিঁপড়ে-মাকড়সার ছবি দেওয়া হয়েছে। এ থেকে প্রায় সব রকমের পিঁপড়ে-মাকড়সা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারবে। এ দু' জাতের মাকড়সারাই লাল-পিঁপড়ে বা নালসোদের অনুকরণ করে থাকে। উভয়ের গায়ের রঙই নালসোদের মতো, কিন্তু প্রথম দিকে বর্ণিত মাকড়সার আকৃতি যেমন হুবহু নালসোদের মতো অপরটা কিন্তু ঠিক সেরকম নয়। তবু হঠাৎ দেখে নালসো-পিঁপড়ে বলেই ভুল হবে। এরা নালসো-পিঁপড়ে শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু প্রথম দিকেরগুলো শত্রুর চোখে ধুলো দেবার জন্যেই পিঁপড়েদের আশেপাশে ঘোরাফেরা করে ছোট ছোট কীট-পতঙ্গ শিকার করে বেড়ায়।

---